ভারত ও বাংলাদেশঃ পারস্পরিক সম্পর্ক SEM II (CC 2-4 TH)

১০৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে এবং ভারতই তাকে প্রথম এক মুক্ত রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি জানায়- যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের কাছে আতীব প্রয়োজনীয়। তবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের এই উন্মেষের মূলে আছে এক সুবিশাল প্রেক্ষিত যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকের বিরুদ্ধে আপোষহীন স্বাধীনতা আন্দোলন, যার সামনে ছিল দলের 'মুক্তি বাহিনী' ও ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, যার পরিণাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে লক্ষাধিক পাকিস্তানী সেনার আত্মসমর্পনের মত ঘটনাগুলি। পাকিস্তানের এই পরাজয় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে।

স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের তামাম সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল এক গভীর সুসম্পর্ক। প্রাথমিক পর্বে অবশ্যই এই প্রত্যাশার অনেকটাই পূরণ হয়। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত হয় 'শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি'। সেই সময় দুটি দেশের মধ্যে ছিল যেমন আদর্শ, আর্থিক এবং রাজনৈতিক ভাবনার মিল, ছিল তেম্নন সাংস্কৃতিক সান্নিধ্য। সর্বোপরি উভয় দেশই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর আন্তর্জাতিক কাঠামোয় নির্জোট নীতিগুলির উপর ছিল আস্থাশীল। তদুপরি নজরুল, রবীন্দ্রনাথ আর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে নিয়ে তৈরী হয়েছিল এপার বাংলা ওপার বাংলা-দুই বাংলার মানুষের গভীর উন্মাদনা। এর সাথে যুক্ত হয় অর্থনৈতিক ও বানিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তৃতি - সদ্য স্বাধীনতালব্ধ বাংলাদেশের কাছে যা ছিল আশীর্বাদস্বরূপ।

তবে ভারত ও বাংলাদেশের উল্লিখিত এই সুসম্পর্ক খুব বেশি দিন স্থায়ীত্ব লাভ করে নি। স্বাধীনতার অব্যবহিত কাল থেকেই বাংলাদেশের এক প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মানুষ, যার মুলে ছিল ভারত বিদ্বেষী মৌলবাদী শক্তি ও পাকিস্তানের পরোক্ষ মদত, ভাবতে শুরু করে যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব আর ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী মূলতঃ ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক দাদাগি রি। ক্রমশঃ এই ধারণা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনের মধ্যেও কৌশলে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়। দেশের মানুষকে শেখানো হয় যে ভারত অচিরেই বাংলাদেশকে তার একটি ঊপনিবেশে পরিণত করবে। এই ধারণায় সংক্রমিত হয়ে দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ মুজিবর রহমানের মত মানুষকেও ভারতের একান্ত অনুগামী হিসাবে ভাবতে শুরু করে। নিন্দুকরা বলেন এই ধরনের মনোভাব তৈরীর পশ্চাতে কম্যুনিস্ট চীনের দক্ষিন পূর্ব এশিয়ায় আগ্রাসন নীতিও এক বড় ভুমিকা নিয়েছিল। এই সব ভাবনা ও আশঙ্কার অন্তিম পরিণতি হয় এক সামরিক অভ্যুত্থান। সামরিক বাহিনীর এক দুষ্ট চক্রের নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালে এই সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয় এবং মুজিবর রহমান সহ তাঁ র পরিবারের প্রায় অধিকাংশ সদস্য এবং মন্ত্রীপরিষদের প্রায় সকলকেই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।এক মাত্র কন্যা হাসিনা দেশের বাইরে থাকায় সে যাত্রায় রক্ষা পান। অভ্যূতপূর্ব এই হত্যালীলার পর সামরিক বাহিনীর বদান্যতায় জিয়াযুর রহমান দেশের শাসক প্রধান হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন।দেশের মানুষের কাছে জিয়াযুর রহমানের গ্রহণযোগ্যতার একটি কারণ হল স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনগুলিতে তাঁর খানিকটা ভুমিকা। তবে সামরিক অভ্যুত্থান উত্তর কালে জিয়াযুর রহমানের মুল লক্ষ্য হয় সামরিক চক্রীর প্রতি অনুগত থাকা এবং মৌলবাদী শক্তির অভীস্ঠ উদ্দেশ্য পুরণ করা। স্বাভাবিকভাবেই জিয়াযুর রহমানের নেতৃত্বে মৌলবাদী শক্তির বিকাশ ঘটে এবং বাংলাদেশ তার সমস্ত ঐতহ্যবাহী ইতিহাস অস্বীকার করে তীব্র ভারত বিরোধী বিদেশ নীতি প্রবর্তন করে।

প্রায় দুই দশক ধরে অস্তিত্বমান বাংলাদেশের ভারতবিদ্বেষী বিদেশ নীতির পরিবর্তন হয় ১৯৯৬ সালে মুজিব তনয়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীনের মধ্য দিয়ে।হাসিনা উপলব্ধি করেন বিশালকায় ভারতের প্রত্যক্ষঃ সাহায্য এবং সহযোগিতা ব্যতীত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর উন্নতি অসম্ভব। ধীরে ধীরে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে এবং সেই বছরেই গঙ্গা নদীর জলবন্টনকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক জলবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বলা বাহুল্য যে গত শতাব্দির মধ্যভাগে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্র কুমার গুজরাল গড়ে তোলেন দক্ষিন এশিয়ার সমস্ত দেশের সাথে শর্তহীন বন্ধুত্ব স্থাপনের নীতি, যাকে সাধারণভাবে 'গুজরাল নীতি' বা Gujral Doctrine বলা হয়। এই নীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আর্থিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রভূত উন্নতি ঘটে। ১৯৯৯ সালে কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে নিয়মিত বাস পরিসেবা শুরু করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ২০০০ সালে দুই দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল নিয়ে আর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বস্তুত এই দশকটি ছিল ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের এক স্বর্ণযুগ। বাণিজ্যিক এই সম্পর্ক আরও বিকশিত হয় 'সাপটা' বা South Asian Preferential Trade Agreement-SAPTA সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। এই চুক্তির ফলে ভারত বাংলাদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বহু পণ্যের উপর শুল্ক হ্রাস বা প্রত্যাহার করে নেয়।

২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার পরাজয় ভারত-বাংলাদেশের সুসম্পর্কের সাময়িক বিরতি ঘটায়। নির্বাচন উত্তরকালে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় আসীন হয় প্রয়াত জিয়াঊর রহমানের সহধর্মিণী বেগম খালিদার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি। বেগম খালিদা জিয়ার সরকার প্রায় প্রথম থেকেই বাংলাদেশের পর্যুদস্ত মৌলবাদী শক্তিকে আবার নতুন করে মাথাচারা দেবার সুযোগ তৈরী করে দেয় যার অনিবার্য ফল হয় ভারত -বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি। ঘর এবং বাইরে বাংলাদেশ তীব্র ভারত বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করে, অবনতি ঘটে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের। দুটি দেশের মধ্যে গড়ে ওঠে এক দুস্তর ব্যবধানের দেওয়াল।

তবে ২০০৮ সালে শেখ হাসিনার শাসন ক্ষমতায় পুনরাভিষেক ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটায়। প্রথমে ২০০৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মিশরে শেখ হাসিনার সাথে একান্ত এক বৈঠকে বসেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে বাংলদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে আসেন। ঐতিহাসিক এই সফরে দুই দেশের মধ্যে তিনটি বিষয়ে মউ বা Memorandum of Understanding স্বাক্ষরিত হয়। এগুলি হলঃ এক, উভয় দেশ একসাথে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করবে; দুই, পরস্পরের মধ্যে নিজ নিজ দেশের কারাগারে আটক ব্যক্তিদের প্রত্যার্পন করবে এবং তিন, উভয় দেশের মধ্যে সংগঠিত মাদক দ্রব্যের চোরাচালান ও অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। পাশাপাশি ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল অবধি আরও যে সব দ্বিপাক্ষিক ছুক্তি দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত হয় তার মধ্যে আছেঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষার উদ্যোগ নেওয়া, ভারত থেকে বিদ্যুৎ রপ্তানি, দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নততর করা, ভারত-বাংলাদেশ পাশপোর্ট ব্যবস্থার সরলীকরণ করা, পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা, বাংলাদেশের পরিকাঠামো, শক্তি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং বাংলাদেশকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা।

বাংলাদেশের অভ্যণ্ত্যরীণ অস্থিরতা ভারত-বাংলাদেশ পারস্পরিক সম্পর্কের চতুর্থ পর্ব অর্থাৎ ২০১৩ সাল উত্তর কালকে খানিকটা হলেও বিবর্ণ করে। বাংলাদেশে শেখ হাসিনার উদার রাজনীতির এক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হিসাবে সেখানে মৌলবাদী জামাতে ইসলামির জঙ্গি কার্যকলাপ নতুন করে বৃদ্ধি পায়। ধর্মঘট, হরতাল, হিংসা আর

মৃত্যুর ঘটনা যেন নিত্য নৈমত্তিক হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে শেখ হাসিনা জাতীয় নির্বাচন আহ্বান জানালে পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল আকার নেয়। জামাত ঘনিষ্ঠ বিরোধী বাংলাদেশ জাতীয় দলের প্রধান খালিদা জিয়া সরাসরি এই নির্বাচন বয়কট করার ডাক দেন। বাংলাসেশের এই সঙ্কট ভারতের উদ্বেগ আর আশঙ্কা বৃদ্ধি করে। কারণ ভারত সতত একথা বিশ্বাস করে যে নিকটতম প্রতিবেশী একটি দেশের যে কোন আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা অচিরেই তার বিদেশ নীতির কাছে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া তার আশঙ্কা ছিল সৎশ্লিষ্ট এই নির্বাচনের পর সরকার গড়া মাত্রই পশ্চিমা দেশগুলি ও তাদের গণমাধ্যমসমূহ হাসিনা সরকারকে অগণতান্ত্রিক ও অবৈধ আখ্যা দিয়ে ঢাকার উপর নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা চাপাতে পারে।

তথাপি ভারত এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শেখ হাসিনার পাশে থাকার চেষ্টা করেছে এবং পাশাপাশি একই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চীমা দেশগুলির সাথে ধারাবাহিক কূটনৈতিক দৌত্য বজায় রেখেছে। নয়াদিল্লির অবস্থান ছিল কট্টর মৌলবাদী জামাতের মত শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দিলে কেবল বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ধংস হবে না, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা আর শান্তিওঁ বিনষ্ট হবে।তাছাড়া এই তথ্য প্রমাণিত যে বাংলাদেশের মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি নির্বিচারে ও নিরন্তনভাবে আরব দেশগুলির কাছে অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের মত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল একটি রাষ্ট্রের রাশ ইসলামিক উগ্রপন্থিদের হাতে চলে গেলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে।আশার কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই যুক্তি অস্বীকার করতে পারে নি।ফলে তারা বারংবার জামাত ইসলামিককে গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করতে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে।

তথাপি ভারত ওঁ বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপনের কতকগুলি অন্তরায় আজও প্রবলভাবে বিদ্যমান। এগুলি হলঃ এক, ৪০৯৮ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত, যেখানে বাংলাদেশ মূলতঃ ভারতীয় 'সীমান্ত বেষ্টিত দেশ' বা Indian Boundary Locked Country, সেখানে সেই সীমান্ত সুরক্ষিত রাখা দুটি দেশের কাছেই এক বড় চ্যালেঞ্জ বিশেষ। দুই, উভয় দেশের সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রপেশ, অবৈধ পাচার, চোরাচালান এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে ভারত বিদ্বেষী বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠীর ঘাঁটির উপস্থিতি। তিন, ভারত ও বংলাদেশের মধ্যে পদ্মা ও তিস্তা নদীর জলবন্টন সম্পর্কিত বিরোধ, ১৯৭২ গঠিত 'যৌথ নদী কমিশন' যদিও বা পদ্মা নদীর জলবন্টন সমস্যা অনেকটাই সমাধান করে, তিস্তা নদীর নিয়ে সমাধান এখনও সুদুরপরাহত। চার, উভয় দেশের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান থাকলেও বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে শুল্ক ও ট্রানজিট সমস্যা কিংবা অবাধ আমদানি-রপ্তানির কোন সুনির্দিষ্ট নীতির অনুপস্থিতি আজও নিষ্ঠুর বাস্তব। পাঁচ, বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রপেশ এবং তজ্জনিত উদ্বাস্ত সমস্যা-যাকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েও প্রতিহত করা যায় নি। ২০০৩ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবাণী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের বিতারণ নীতি বা Push Back Policy গ্রহণ করলে বাংলাদেশের সরকার যারপরনাই কুপিত হয়। ছয়, নারী, শিশু ও মাদক চোরাচালানেও বাংলাদেশের সীমান্তটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কাছে একটি নিরাপদ করিডর বা Safe Corridor হিসাবে পরিচিত। সাত, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের কাছে সন্ত্রাসবাদের যে ভয়ংকর পরিচিতি, বাংলাদেশের মাটিকেও, অনেক নিন্দুক, তার ধাত্রী বা Cocoon of Terror বলে গণ্য করেন। এবং আট, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বন্ধুর করার প্রচেষ্টার পশ্চাতে ধর্মীয় মৌলবাদের এক বিরাট ভুমিকা বিদ্যমান। শেখ হাসিনা ব্যতীত অন্য সব শাসক প্রধান মৌলবাদের এই উদ্দেশ্যকে কুসুমাস্তীর্ণ করেছে। দুঃখজনক হলেও একথা বাস্তব যে, অধুনা শেখ হাসিনাও এই সব মৌলবাদী শক্তির প্রতি অপেক্ষাকৃত নমনীয় মনোভাব পোষণ করছেন। উদাহরণঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্লগারের মৌলবাদীদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার ঘটনাগুলি।

উপরি উক্ত অন্তরায়গুলিকে অতিক্রম করে দুই দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সম্পর্ক সহজ ও সাবলীল করার প্রচেষ্টাও কিন্তু একই সাথে উল্লেখযোগ্য। ২০১৫ সালের ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক স্থল সীমান্ত চুক্তি, যা দীর্ঘদিনের ছিটমহল সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করে। তাছাড়া বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি, সন্ত্রাসবাদ দমন ও বন্দী প্রত্যার্পণ এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ত্বরান্বিত করার জন্য অধিকতর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি উভয় দেশই প্রদান করেছে। সবশেষে 'ট্রানজিট' বা Transit বিষয়টির কথা বলা যায়। বাংলাদেশের কাছে ভারত প্রস্তাব রেখেছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে মায়ানমার থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ভারতে আসুক। প্রস্তাবটি আটকে আছে তিস্তার জলবন্টন বিষয়টি অমীমাংসিত থাকার কারণে। বাংলাদেশ যদি কখনও এই প্রস্তাবটি মেনে নেয় তাহলে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিক উন্মোচন হবে।এর ফলে বাংলদেশেরও প্রভূত উপকার হবার কথা। যেমন তার পক্ষে নেপাল ও ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে খনিজ তেল ও অন্যান্য বহু জিনিস সরাসরি আমদানী করা সম্ভবপর হবে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ও ভারতের হলদিয়া আর পারাদ্বীপ বন্দরের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান প্রদান উত্তরোত্তর বাড়বে। আর এইভাবেই ভারত ও বাংলাদেশের বিদেশ নীতি পরস্পরের প্রতি অনুকূল, সংগতিসূচক এবং সহযোগিতমূলক হয়ে উঠবে।।